দ্বিরালাপ সংগ্রহ - ১

আমাদের চিন্তাবিশ্ব

সম্পাদনা

তপোধীর ভট্টাচার্য
স্বপ্না ভট্টাচার্য

মানুষ আজও কথা বলে। কী সেই কথা? দুই একে দুই, দুই, দু'গুনে চার, তিন দু'গুনে ছয়...এই ধারাপাতের বৃত্তের ছকে দাঁড়িয়ে অস্থির পদচারণা, ভোগের নেশায় বেহুঁশ আচরণ,...যৌনাচারের বেলেল্লাপনায় ডুগডুগি বাজানো সময় ক্ষয় করে দিচ্ছে যে সুস্থ জীবনবোধকে—সেখানে কি সমার্থক সঙ্গ অথবা সঙ্গহীনতা?

বিজয়া দেব

জনারণ্য এই শহর তবু বড় একা লাগে

যেহেতু সম্পর্ককে মানুষ নির্মাণ করে আবার সম্পর্কই মানুষকে তৈরি করে তাই বলা যায় এই দুই-এর মধ্যে অবশ্যই একটা দ্বিরালাপ চলতে থাকে। যে-কোনও একটি সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার পর সেই বন্ধন যদি কখনও ছিন্ন হয় তখন এর রেশ খুব সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না। আবার এটাও তো সত্য যে নতুন মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন সময় নতুন করে গড়া সম্পর্ক আমাদের জীবনকে নতুন মাত্রা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সম্পর্কের এত ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গ উঠে আসে কেন? তাহলে কি সম্পর্ক মানুষকে কিছু দেয় না? আর যদি দেয় তাহলে কেন বলা হয় 'বড় একা লাগে এ আঁধারে মেঘের খেলা আকাশ পারে।'

বিশ্বায়নের এই অত্যাধুনিক পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত প্রচলিত ধরনকে পাল্টে ফেলার প্রস্তুতি চলছে। একদিকে যেমন অচেনা জগৎকে চেনা করে তোলার প্রয়াস তো আবার অন্যদিকে চেনা জগৎকে অচেনা করে তুলে সমকালীন মানুষ হয়ে উঠেছে বদ্ধপরিকর। তাহলে এমন পরিবেশে এ ধরনের গুঞ্জন কেন ধ্বনিত হয়, 'মানুষ বড় একলা তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।' পথ চলতে চলতে যেমন এই কথাগুলি ভাবিয়ে তোলে কোনো সংবেদনশীল মানুষকে আবার সেকথাগুলো ভাবতে ভাবতে পথ চলতে হয় তার। আবার 'কেন' এই শব্দটি উঠে আসা মাত্রই এর সূত্র ধরে আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে: 'কী করণীয়?' এই সম্পর্কটাই বা কখন নিঃসঙ্গতায় পর্যবসিত হয়? আবার নিঃসঙ্গতারও ভেতরে তো একটি সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা আছে।

পরিচিত নামের নাগপাশে আবদ্ধ প্রতিটি সম্পর্ককে পাওয়া যাবে, তা যেমন সত্য নয়, আবার পাশাপাশি এটাও তো সত্য যে, নামবিহীন সম্পর্কের বীজও হৃদয়ে বপন হতে পারে, হয়ে থাকে অর্থাৎ চিরাচরিত নামের খোলসকে ভেঙে দিয়ে খোলামেলা বাঁধনছাড়া সম্পর্ককে মেনে নিতে হয়। অবশ্য প্রচলিত সংস্কারকে তুড়ি মেরে নতুনকে স্বীকার করতেও যেন কোথাও বাধার সৃষ্টি হয়। আর এরই সূত্র ধরে দেখা দেয় বর্ণনাতীত নিঃসঙ্গতা। অথচ চেনা সম্পর্কের মধ্য থেকে দাঁত, নখ বেরিয়ে আসে কতভাবে। এই সম্পর্ক কি সম্পর্ক নাকি সঙ্গ তৈরি করার ছলে নিঃসঙ্গতার চাষ? সম্পর্কের বিন্যাস থেকে বেরিয়ে আসে নিঃসঙ্গতা। এটাও আপেক্ষিক সত্য যে ক্ষনিক শৃঙ্খল মুক্ত করে অনন্ত শৃঙ্খলে বাঁধতে গেলে অর্থাৎ বাঁধতে বাঁধতে সম্পর্ককে খোলা এবং খুলতে খুলতে সম্পর্ককে বাঁধা : এই দুই-এর মধ্যেই সম্পর্কের সঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতা উভয়ই কার্যকরী হয়ে ওঠে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ফিরে আসে : 'কী করণীয়?' অর্থাৎ ব্যস্ততাবহুল জীবনে নিঃসঙ্গতা কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে? এই প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য আজকের বৈদ্যুতিন

...মের পৃথিবীতে যেখানে 'সময়ের অভাব' শব্দটি অনিবার্য ভাবে প্রযোজ্য, সেখানে ...নিঃসঙ্গতার আদৌ কোনও স্থান আছে? যদি বলি হ্যাঁ, তবে তা থেকে উত্তরণের ...ই বা কী? হয়তো অন্য কোনও কিছুর অভ্যাস, যা চিরন্তন সত্য, চির শাশ্বত, ...সুন্দর অর্থাৎ ভালবেসে পড়ার অভ্যাস ও ভাবনার মন্থন। যেহেতু প্রতিটি মানুষই ...মতান্তর সৃষ্টি হওয়াটাও অসম্ভব নয়। মানুষের ধারণায় এই কথা থাকতেই পারে, ...তার একমাত্র প্রতিষেধক হতে পারে মানুষই কেননা, 'মানুষ মানুষেরই জন্য'। এভাবে বলা যায়,

'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে,

....

আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালবাসি'

...খন যে-কথাগুলো না-বললে আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে যায়, ...র্পর্কের বিনির্মাণ ও এর মধ্য দিয়ে সম্পর্কের পুনর্নির্মাণের প্রয়াসই মানুষের ...িক। সাহচর্যে নতুন হয়ে ওঠা এবং সেইসঙ্গে নিঃসঙ্গতাকেও নতুন করে ...তে শেখানো-ই জীবনের প্রকৃত পাঠ।

রূপা ভট্টাচার্য

নারীপরিসর
সমাজে ও সাহিত্যে
সম্পাদনা
বরুণজ্যোতি চৌধুরী

রূপা ভট্টাচার্য

মল্লিকা সেনগুপ্ত, নারী কবিতার ভুবন

'সময়ের কিনারা থেকে সময়ের দূরতর অন্তঃস্থলে সত্য আছে, ভালো আছে, তবুও সত্যের আবিষ্কারে', মল্লিকা সেনগুপ্তের বহুমাত্রিক কাব্যপরিমণ্ডল পরিক্রমা করতে গিয়ে জীবনানন্দের বহুস্বরিক বাচন মনে এল, জীবন ও কবিতা একই জিনিসের দুরকম উৎসারণ। এই ধারণাকে প্রণিধান যোগ্য করে যদি এগিয়ে যাই, তখন দেখি বাংলা সাহিত্যে নারী কবিদের সংখ্যা খুবই কম। সত্যি কথা বলতে কি, নারী কবিদের রচনা যে উল্লেখযোগ্য এই ধারণাটিই তৈরি হয়নি; আমাদের দেশে মেয়েদের লেখালেখি নিয়ে আগ্রহ তো একেবারে হাল আমলের কথা। কিন্তু আমাদের পড়া তো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরই একটা নির্মাণ। এই সত্য আমরা আগে ততটা বুঝতে পারিনি। আমরা ভেবেছি পুরুষের চোখ দিয়ে যেসব কবিতার ভাষা ও ভাবনা ব্যক্ত হচ্ছে, তাতে যারা নারী তাদেরও জীবন সমানভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। নারীর ভাবনার যে আলাদা একটা পরিসর আছে এটা নিয়ে সচেতনতা তখনই এল, যখন প্রতীচ্যে নারীচেতনাবাদী ভাবনা দিনদিন জোরালো হয়ে উঠল। তবে আমাদের দেশে তা পৌঁছেছে অনেক দেরিতে। বলা ভালো আমাদের বিদ্যায়তনিক পাঠে পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা এতটাই নির্লজ্জ ভাবে প্রখর যে সেখানে মেয়েদের কবিতার আলাদা পরিসর কখনও স্বীকৃতি পায় না। অথচ আমাদের বাংলা সাহিত্যে রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, কেতকী কুশারী ডাইসন, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, দেবারতি মিত্র : এরা ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকের আগেই নিজেদের আলাদা কণ্ঠস্বর ব্যক্ত করেছেন। যদিও তাদের বিশ্ববীক্ষা হয়তো নারীচেতনাবাদী নয়, তাদের অবস্থানও যে সর্বত্র সমান মাত্রায় প্রতিফলিত হয়, তাও বলা যায় না; কিন্তু মেয়েদের বয়ান যে তথাকথিত লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষের বয়ান থেকে আলাদা, এই ভাবনাটা কিন্তু তাঁরাই আমাদের মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সত্তরের দশকের শেষে বা বলা যায় আশির দশকের গোড়া থেকেই বাংলা কবিতায় নারী কবিদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁরা একটা পাঠান্তর বা পর্বান্তর সূচনা করতে পেরেছেন। এই প্রেক্ষিতে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত বিশেষ করে আমাদের নিবিড় পাঠ দাবি করেন। যদিও তিনি মুখ্যত একজন কবি, তবে তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধের বই যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে! যেমন 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র' ইত্যাদি। এবং এর মধ্যে দেখা যায় যে কবিতায় যা বোঝাতে বা বলতে চাইছেন, তার পরিপূরক হিসেবে এইসব প্রবন্ধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও জোরালো

ভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আমরা যেভাবে সাহিত্যকে দেখে অভ্যস্ত, এর বাইরে একটা বিকল্প দৃষ্টিও থাকা সম্ভব, মল্লিকার কবিতা আমাদের [illegible] অবহিত করে তুলেছে। আর এভাবেই তিনি আমাদের অনেক চিরাচরিত ভাবনার [illegible] করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' (১৯৮৩)। আমাদের এ সমাজে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত যে লিঙ্গ-বৈষম্যের দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ, আমাদের ব্যক্তিগত [illegible] বা নান্দনিক উপলব্ধি (যা আমাদের) সেটাও কি আশ্চর্যভাবে লিঙ্গ-অভিজ্ঞানের দ্বারা নির্মিত সেটা মল্লিকা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' থেকে অন্যান্য কবিতা পরিক্রমা করলে বোঝা যায় প্রায় প্রতিটি কবিতাই গভীর ভাবে সাংস্কৃতিক রাজনীতি [illegible] সম্পন্ন। পিতৃতান্ত্রিক লৈঙ্গিক প্রতাপ আবহমান কাল ধরে মেয়েদের যে পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে, তাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যই মল্লিকা যেন কবিতাকে তাঁর যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'র পর প্রকাশিত হয় 'সোহাগ শর্বরী' (১৯৮৫) , 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' (১৯৮৮), 'হাঘরে ও দেবদাসী' (১৯৯১), 'অর্দ্ধেক পৃথিবী' (১৯৯৩) , 'মেয়েদের অআকখ' (১৯৯৭), 'কথামানবী' (১৯৯৭), 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই' (২০০১), 'দেওয়ালির রাত' (২০০১), 'পুরুষকে খোলাচিঠি' (২০০২), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' (২০০৫), 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা' (২০০৬), এইসব বই এর মধ্য দিয়ে সেসব বয়ানের মুখোমুখি হই আমরা; তার মধ্য দিয়ে একটাই বার্তা উঠে আসে পাঠকের কাছে যে, পুরুষতন্ত্র নারীত্বের যে আঙ্‌রাখা নির্মাণ করেছে চিরকাল, নারীকে দেবতার আসনে বসিয়েছে, নতুন চেতনা সম্পন্ন কবি তাকে প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন। মেয়েদের উপর পুরুষরা চাপিয়ে দেয় যে কল্পনার তৈরি একটা প্রতিকৃতি এক আদর্শায়িত প্রতিমা, অনেক সজ্জা প্রসাধন, তার আড়ালে লৈঙ্গিক প্রতাপের যে বিকার, তার কুশ্রীতা জান্তবতা কীভাবে উপস্থিত সেদিকে তর্জনি সংকেত করেছেন মল্লিকা। মল্লিকা কখনও বিষয়ীকে বড় করে তুলতে চাননি। তাঁর কবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের প্রত্যাখ্যান, শুদ্ধ কবিতার নামে অনেক সময় মেয়েদের একটি স্পর্শভীরু জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের আসল [illegible] ও অবস্থানগত সত্য তো এই যে তারা নৈঃশব্দ্য দ্বারা লাঞ্ছিত। তাদের নারীপরিসর কারও চোখে ধরা পড়ে না। এটাকেই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন মল্লিকা। তিনি বিষয়টাকেই বড় করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি কবিতার সূক্ষ্মতা ও গভীরতাকে অব্যাহত রেখেই বিষয় প্রাধান্যকে মান্যতা দিয়েছেন। আসলে তিনি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। তিনি লৈঙ্গিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন। তিনি যে নারীপরিসরের কথা ভাবেন তা বহুস্বরিক। তা যতটা সামাজিক, ততটাই রাজনৈতিক, যতটা সাংস্কৃতিক, ততটাই মনস্তাত্ত্বিক। পুরুষতন্ত্র মেয়েদের অভিজ্ঞানটাকেও দখল করে নিতে চেয়েছে। আর তাই মেয়েদের পরিসর অন্ধকার কৃষ্ণবিবরে আচ্ছন্ন। পারাপারহীন যে এক নৈঃশব্দ্য জাগিয়ে রেখেছে নারী পরিসরকে, তা-ই মন্থন করে মল্লিকা সেনগুপ্তের আবির্ভাব। আধুনিকতাবাদ যে ব্যক্তি-অভিমুখী সমষ্টিচেতনার মধ্য দিয়ে নারী-পাঠকৃতিকে এক উত্তরণের দিশা দেখিয়েছেন।

শরীরকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি মন্থন করে একদিকে ব্যক্তিগত ও অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক যে দ্বিরালাপের গ্রন্থনা তৈরি করে, তার সফল উপস্থাপনা এই সংকলনে লক্ষ করা যায়—

'শত শরতের বীর্যে আমার স্বামীকে সাজাও
অগ্নিদেবতা— আমার প্রথম স্বামী ছিল সোম
দ্বিতীয় দেবতা না, গন্ধর্ব, তৃতীয় অগ্নি
তুমি, যে আমাকে মানুষ স্বামীর হাতে তুলে দেবে।'

(অগ্নি প্রদক্ষিণ)

ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ করে নারীর নিজস্ব কবিতার ভুবনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নারীর ব্যতিক্রমী বয়ানকে নান্দনিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মল্লিকা।

"যে রাত কাটালে প্রণাম জানাও তাকে হে রমণী / বন্দনা করো
পুরুষের, বলো আমিই পৃথিবী / তুমি .... / আর সাক্ষি রইল
ওখানে কামুক, / এই মাটি ঘাস মেট্রোপলিস সব আমাদের।"

(সহবাস)

তারপর 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' এর দিকে দৃষ্টি ফেরালে সূক্ষ্ম কাব্যভাষার, ব্যাপকতর পরিধি লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে এই সংকলনটি বহুমাত্রিক বলা যায়। নারীর জৈবিক অভিজ্ঞান কীভাবে কবিতায় চিহ্নায়ন প্রকরণ হয়ে উঠেছে তা জোরালো ভাবে লক্ষ করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সংকলনে তা হল, মল্লিকার প্রবণতা ঋজু ও সহজ হয়ে ওঠার দিকে। লৈঙ্গিক অবস্থান নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে যখন 'জলের মাছ' কবিতায় লেখেন,

"শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে আমি কার আঙুলে নির্ভর করব বলো
/ জলের তছনছ আমূল কোলাহল, শরীর নিয়ে আমি উঠে
এলাম ...."

আবার 'সম্রাজ্ঞীর প্রেম' কবিতায় যখন তিনি বলেন,

"আমার যত রূপ বিড়ম্বনা শুধু, শরীর ক্ষয়ে গেল,
মাটির কান্নায়, প্রেমের মধুটুকু পিঁপড়ে খেয়ে নেয়।'

তাই বলা যায়, পাঠকৃতি ক্রমশ মল্লিকার হাত ধরেই যেন লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার ধারণাকে চুরমার করে দিচ্ছে। 'মা-ভূমি' নামক কবিতাটি নারীপাঠকৃতির একটা চমৎকার শিল্পিত নিদর্শন। যেখানে মেয়েদের সম্পূর্ণ নিজস্ব শারীরিক অভিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে।

"আঠাশ দিনের মাথায় আমার
রক্তকলস পূর্ণতা পায়
আঠাশ দিনের মাথায় গাছের
ডগায় ফুটছে রুদ্রপলাশ
এখন আমার সানুদেশ জুড়ে

"আমার কবিতা গ্রামীণ পটচিত্রের মতো মানুষ আর মেয়ে
মানুষের ছবির কথা লিখতে চেয়েছে। কথামানবীর মতোই
ইতিহাসের ছাই ও ভস্মের মধ্যে নারী নামক তো আগুন চাপা
পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন।
আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই,
লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি।"

এই আগুনের আত্মকথন ও ইতিহাসের ভস্মস্তূপ থেকে পূর্বমাতৃকাদের দহনকথা সঙ্গে নিয়ে নিষ্ক্রমণ তো অতুলনীয়। তবে তার আগে তিনি কষাঘাত করতে চেয়েছেন পঞ্চাশের এই কুযুক্তিশৃঙ্খলকে যেমন, 'তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত'। এই ব্যক্তিগত পবিত্রতার অন্তরালে রয়েছে নিপীড়নের ইতিহাস, নারী-নিগ্রহ। এই চূড়ান্ত যন্ত্রণাজনক সত্যটাকে ভাঙতে চেয়েছেন মল্লিকা। 'কথামানবী'তেও ফুটে উঠেছে এর সর্বাত্মক বিনির্মাণের ঘোষণা।

"কথামানবী সেই নারী যে যুগান্তরের অপমান আর অবহেলার পরেও ভালবাসতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, যে নতুন জন্ম নিয়ে ফিরে আসে দ্রৌপদী, গঙ্গা, সুলতানা রাজিয়া, মাধবী, মেধা পাটেকার, মালতী, মুদি, শাহবানু বা খনার মধ্য দিয়ে, যে হেঁটে চলে যুগ থেকে যুগান্তর মিশে থাকে প্রতিটি ভারত-কন্যার রক্তে, যে ইতিহাস এবং অনাগত, একক এবং সহস্র, অশ্রু এবং আগুন; যার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় সে নিজেও জানে না।"

মানুষের অসম্পূর্ণ ইতিহাসকে পূর্ণতার দিকে সঞ্চারিত করাই কবির প্রকৃত অভিপ্রায়। মল্লিকার কথামানবীর সুরেই জেগে উঠেছিল।

"ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনও দিন রাজা হয়নি। প্রজাও হয়নি। হয়েছে রাজার বউ আর প্রজার বউ। সুয়োরাণি, দুয়োরাণি, আর ঘুঁটেকুড়ানি। একবার, শুধু একবার রাজা হয়েছিলাম, মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমি কথামানবী হয়ে উঠেছিলাম সুলতানা রাজিয়া। দিল্লীশ্বরী। আঃ তারপর লোকজনের কী অশান্তি! একটা খুবসুরত জেনানা একা একা দিল্লীর মসনদে বসে থাকবে, দিল্লীর মরদের কাউকে বিয়ে না করে বাদশাহী চালিয়ে যাবে। এও কী সম্ভব! তাবড় তাবড় পুরুষেরা এরকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড মেনে নেবে! নাঃ মেনে নেয়নি। মেনে নিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর হয়েছে। পঞ্চায়েতে মেয়েদের আনাগোনা হচ্ছে। কিন্তু মহিলা বিল ফিরিয়ে দিলেন রাজনীতির পুরুষ পুরুষেরা। মেয়েরা সম্মানে সামনে শাসন ক্ষমতা হাতে নেবে, এই দৃশ্য দেখার চেয়ে তারা মরে যাবেন সেও ভি আচ্ছা। মেয়েদের আটকাতে হবে, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলে ঝাঁপিয়ে পড়েন অমুক প্রসাদ যাদবের দল। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে, যেমন চলছিল আমার রাজিয়া জন্ম ..."

তাই বলা যায় একটি বিকল্প বয়ানের প্রস্তুতি কবিতার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত।

সুবোধ সরকারের সঙ্গে বিয়ের পর প্রকাশিত হয় 'সোহাগ শর্বরী'। মল্লিকার কবিতার ভুবন পরিক্রমা করে এই বইটিকে মল্লিকার জলবিভাজন রেখা বলা যেতে পারে। এখানে

আমাকে জাগিয়ে দাও ঝলমলে জীবনের স্বাদে
মাথাভর্তি চুল দাও, চোখে দাও কটাক্ষ বিদ্যুৎ
আমার আকাশে দাও মেঘ বৃষ্টি আলো।

(আমাকে সাজিয়ে দাও ভালবাসা১)

শিশির তোমার কেন কোনওদিন অসুখ করে না,
রোদ্দুর কখনও বুঝি মন খারাপ হয় না তোমার?
সারস তোমাকে কেউ প্রতারণা করেনি কখনও?
আমিও শিশির হয়ে, রোদ্দুর, সারস হয়ে থেকে যেতে চাই পৃথিবীতে

(আমাকে সাজিয়ে দাও ভালবাসা ২২)

মল্লিকা আজ ইন্দ্রিয়াতীত। তবু দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারছি মল্লিকা অমর। মল্লিকারা বেঁচে আছেন বেঁচে থাকবেন এবং সম্পূর্ণ মানবিক পৃথিবীর প্রত্যাশী অমল হৃদয়ের কাছে আর মানবকেন্দ্রিক নান্দনিকতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার লড়াইও থাকবে অব্যাহত। সৃষ্টি হবে নব পথ ও পাথেয় তাই 'আগুনের পথে হেঁটে যায় যারা সাহসী / তার পথে বেজে উঠুক পাঞ্চজন্য।

সব মিলিয়ে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার ভুবন পরিক্রমণ করে আমরা এসে পৌঁছই সূর্যোদয়ের নুতন পরিসরে। এখানেই মল্লিকার অনন্যতা।

কুয়াশা জমছে নীরক্ত শ্বেত
রক্ত নামছে উষর মাটিতে
মাতৃভূমি গুল্মগর্ভা হবেন।'

আর এখানেই যেন নারীসত্তা ও তার নির্মাণ-এর দিকটি লক্ষ করা যায় তো অন্যদিকে ব্যক্তি-নারীর বাইরে গিয়ে সমষ্টি নারীচেতনার দিকটিও প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। যেমন, 'আগুন বাহক' কবিতাটিতে রয়েছে,

''সুপুরুষ এসেছিল, আসেনি নারীরা
আমি সিন্ধুর মেয়ে, মাটি জল ঘাসে
মথিত নক্ষত্র আমি, যোদ্ধা ও মানুষ
কালো মেয়েদের পায়ে তামার গগন
এত দীপ্যমান চোখে ঘোড়সওয়ারেরা
গর্ভে অগ্নি ঢেলে দিল, জন্মাল কার্তিক
শুধু বীর যোদ্ধা নন, রক্তের মিশ্রণ
আমার সন্তান স্বামী সহোদর এরা
আমারই গর্ভে হল নদীমাতৃক।'

এটাকেই বলা যায় ইতিহাসের নারীচেতনাবাদী পাঠ। যে-ইতিহাস প্রচলিত ধারায় ছিল 'হিজ স্টোরি', তাকেই এক নব আঙ্গিকে রূপান্তরিত করলেন মল্লিকা। 'হার স্টোরি'তে। 'কন্যা', 'স্বয়ংবরা মাটি', 'তস্কর পালাল', 'বাতাসের ছেলে' ও 'অশ্বমেধ' ইত্যাদি পাঠকৃতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষের বহুমাত্রিক বৌদ্ধিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বলাই বাহুল্য, আটপৌরে বাংলা ভাষাতেও মল্লিকা মন্দাক্রান্তা ছন্দের সাবলীল ও লাবণ্যময় সংযোগ ঘটিয়েছেন। মেয়েলি বাচনের আরও নিদর্শন চিরে চিরে ব্যাপ্ত হয় এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে, 'ভাসুরের কাছাকাছি এলোচুলে থাকি না, কখনও/খোঁপায় জড়িয়ে নেব লাল ফিতে।' যৌন সম্পর্কজনিত শারীরিক অভিজ্ঞতার খুব সাহসী ও অকপট অভিব্যক্তির পরিচয় মেলে তাঁর 'জম্বু দ্বীপের চাঁদ' ও 'স্বামীর কালো হাত' কবিতাদ্বয়ের মধ্যে। যা আমাদের শুচিতামনস্ক পাঠাভ্যাসের অচলায়তনে এক বিশাল বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে।

'হাঘরে ও দেবদাসী' কাব্য সংকলনে তাঁর বাচন আরও শানিত হয়েছে। কাব্যিকতার নানা উপকরণ তিনি যোগ করেছন। বলা ভালো আটপৌরে গদ্যের ভঙ্গিটিকে তিনি কবিতায় স্থান দিয়েছেন। প্রান্তিক নারীর তথাকথিত ইতিহাস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 'আম্রপালী' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয়।

''আম্রপালী পালিয়ে যায়, পেছনে তার সমাজ তাড়া করে
আম্রপালী বাঁচতে চায়, সমাজ চায় প্রাণ লোপ হোক।'

এটাকে বলা যেতে পারে ইতিহাসের কৃষ্ণ যবনিকা যা উত্তোলন ও জীবন পুনঃপাঠের জন্য নারীচেতনার ইস্তাহার। তারপর 'অর্ধেক পৃথিবী' সংকলনে রয়েছে 'আপনি বলুন মার্কস' ও

'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি' এর মতো বহু আলোচিত কবিতা। মল্লিকা চান নারীচেতনাবাদী পাঠ হোক সর্বত্র। যেমন— 'আপনি বলুন মার্কস' এ তিনি লিখেছেন।

''কখনও বিপ্লব হলে
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে,
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?'

নিঃসন্দেহে আজকের এই পৃথিবীতে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। এই একই ভাবনার গুঞ্জন রয়েছে ফ্রয়েডকে খোলা চিঠিতেও। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দৃষ্টিকটু ভাবেই পুরুষতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত সম্পন্ন। এবং এজন্যই তিনি সরাসরি ফ্রয়েডকে সম্বোধন করেছেন এবং সেখানে যে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণ হচ্ছে না এটাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মহাভারতের কথাবীজ অবলম্বন করে লিখেছেন 'পাণ্ডুর পুত্রাকাঙ্ক্ষা' কাব্যটি। একই মনোভঙ্গি রয়েছে 'অনার্য' নামক কবিতায়। 'তুতান খামেনের মা' 'দুয়োরাণি' ইত্যাদি কবিতায়ও এই ভাবনার প্রসার ঘটেছে। ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক কবিতার দ্বিরালাপকে তিনি সর্বত্রগামী করে তুলতে চেয়েছেন। নারী চেতনাবাদী ভাবনাকে অটুট রেখেই 'ভালবাসা', 'মা', 'ডাইনি', 'বিবাহগাথা', 'রানরাজা', 'অন্ত্রপুরুষ' ইত্যাদি কবিতায় উপস্থাপনা-বৈচিত্র্য, ভাবাগত ও বাচনগত বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একুশ শতকে নতুন স্বপ্নে চোখকে রাঙিয়ে প্রকাশ পেল তাঁর কবিতার বই 'মেয়েদের অ আ ক খ'; এক নতুন প্রতিবাদী স্বর, এক নতুন বর্ণবোধ যেন ধ্বনিত হল তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে।

''ধর্মের কল পুরুষ নাড়ে / ধর্ম ছুঁড়ে ভীষণ মারে;
নারীবাদের একুশ শতক / মেয়েরা চায় নিজস্ব হক;
বিবাহ মানে সারাজীবন / ভাঙাগড়ার অবগাহন;
ভালবাসার গুপ্তধন / নবজীবন অন্বেষণ;
যোনি আমার উপনিবেশ / শিব ঠাকুরের আপন দেশ।'

আরও 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই' ও 'দেওয়ালির রাত' কাব্য সংকলনও একুশ শতকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই বলা যায়, প্রায় দুই শতকের কবিতা চর্চায় মল্লিকা হয়ে উঠেছেন নারীচেতনাবাদী কবিদের মধ্যে অগ্রণী। স্পষ্টতা, ঋজুতা ও প্রত্যক্ষতাই তাঁর অভিজ্ঞান। লিঙ্গ-বৈষম্য প্রত্যাখ্যান করে তিনি এক সম্ভাব্য নতুন সত্যের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাঁর প্রায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা' আমাদের আপ্লুত ও বিষণ্ণ করে, যখন জানি যে কবি মারাত্মক কর্কট রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংকলনের বেশ কিছু কবিতায় যদিও পরিচিত ভাবনার বিস্তার ঘটেছে, তবু, সাম্প্রতিক কবিতাগুলিতে স্পষ্টতই পুরোপুরি এক নতুন মল্লিকাকে পাচ্ছি। যার কণ্ঠস্বর জীবনের প্রতি ভালবাসায় স্নিগ্ধ কোমল ও সংবৃত্ত। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা ও মানবিক কারুণ্য আমাদের মর্মস্পর্শ করে।

ক. ভালবাসা ভালবাসা বাঁচাও আমাকে

নারীপরিসর
সমাজে ও সাহিত্যে

স ম্পা দ না

বরুণজ্যোতি চৌধুরী

বাংলা বিভাগ। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

দি সী বুক এজেন্সী। কলকাতা